বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.010

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

মনসুর মুসা, *পাণিনি, চমস্কি ও তারপর*, প্রকাশক : মধ্যমা মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, মূল্যঃ ৪০০ টাকা, পৃ. ২৬১

'পাণিনি, চমস্কি ও তারপর' গ্রন্থটি মনসুর মুসা কর্তৃক রচিত ভাষাবিষয়ক একটি প্রবন্ধ সংকলন। এটি মূলত তাঁর আলোচনা, সমালোচনা, বক্তৃতা ও লেখার সংকলন।

বইটির নামকরণ থেকে আমরা অবগত হতে পারি যে, এখানে ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশ এবং প্রসারণের বিভাগকে ত্রিমাত্রিকতায় বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন– একদিকে আছে বৈদিক ঐতিহ্যের ধীমান সাধক পাণিনি। অন্যদিকে আছে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তীক্ষ্ণধী দিক-নির্দেশক নোয়াম চমস্কি (১৯২৮- বর্তমান)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষানুসন্ধানের জগতে, এই দুজন পণ্ডিত সর্বাধিক পরিচিত। এবং এই দুজন ব্যক্তির পথ-নির্দেশনায় বা তাঁদের অনুসরণে তৈরি হয়েছেন অনেক জ্ঞানপিপাসু, অনুসন্ধিৎসু গবেষক, বিজ্ঞানী যারা ভাষাবিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ধারাকে সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বইটির সামগ্রিক আলোচনায় আসলে প্রথমেই 'ভূমিকা নয়, উপকথন' নামকরণটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এতে লেখকের অনুশীলন, শব্দগঠন, শব্দ ব্যবহার এবং ভাষা ব্যবহারের সূক্ষ্ম ভাব-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আঙ্গিক গঠনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি বইটি মোট ৬টি পর্বে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পর্ব বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পর্ব ৬টি যথাক্রমে– ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণ, ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব, ভাষা-ভাবনা, উপভাষা ও ভাষারীতি, প্রযুক্তি ও ভাষা, বিবিধ বিষয় এবং সর্বশেষ অংশে আছে নির্ঘণ্ট।

'উপকথন' অধ্যায়টিতে আমরা লক্ষ করি, ভাষাবিজ্ঞান চর্চা, ভাষাবিজ্ঞান সংবলিত বিষয়াদি, বৈয়াকরণিক জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে ওঠার প্রাথমিক মাধ্যমগুলোর সাবলীল বর্ণনা। সর্বপ্রথম লেখক পাণিনির নাম শুনেছিলেন তাঁর শিক্ষক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অনুশীলন ক্লাসে। এভাবে ক্রমান্বয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাগ্রহণের তাগিদে গিয়ে জানতে পারেন প্রাচীনকালের আরো অনেক ব্যাকরণবিদকে। তিনি ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব পড়তে গিয়ে সেখানে জানতে পারেন বৈয়াকরণ জগতের দিকপাল নোয়াম চমস্কির সম্পর্কে।

'ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণ' পর্বে মোট ৭টি পর্ব রয়েছে। প্রবন্ধ ৭টি যথাক্রমে 'পাণিনি ও তাঁর ভাষাচিন্তা', 'পাণিনি ও বাঙলা ব্যাকরণ', 'বৌদ্ধ সংস্কৃত ধারণার পুনর্মূল্যায়ণ', 'ভাষাবৃত্তি', 'অমরকোষ পরিচিতি', 'নতুন বাংলা ব্যাকরণঃ আলোচনা চক্র', 'বাংলা নতুন ব্যাকরণের কথা'।

প্রবন্ধগুলোর নামকরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সেই পাণিনির যুগ থেকে ক্রমান্বয়ে ভাষার গতিবিকাশের যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে প্রবন্ধগুলো রচিত হয়েছে। আমরা জেনেছি যে, পাণিনি বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ছিলেন। বেদের ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রেষণা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনায়। এটি ভাষার ব্যাকরণ। 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ ৪৯৯৬টি সূত্রে গ্রথিত। তবে পাণিনির ব্যাকরণ ভাষা সংক্রান্ত হলেও ধর্মীয় বিরোধের কারণে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা এটিকে গ্রহণ করতে চাননি। কিন্তু পরবর্তীকালে কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরি প্রমুখ পণ্ডিত এ বিষয়ে কাজ করেছেন। এবং কাজটি করেছেন পাণিনির ভাষাচিন্তা উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে।

যেহেতু পাণিনির ব্যাকরণ ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে একটি অত্যাশ্চার্য মানব মনীষার নিদর্শন; তাই এর সূত্রগুলোকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা করার মাধ্যমে পাণিনির ভাষা সংক্রান্ত চিন্তাগুলোকে অনুধাবন করা জরুরি। আর সেটা আমরা এই গ্রন্থটিতে লক্ষ করি।

'পাণিনি ও বাঙলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে জানা যায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নির্মাণে পাণিনির অবদান সম্পর্কে। এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী'তে মোট ৩০৫টি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাকে ৩৯৯৬টি সূত্রে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন।

ধ্বনিরূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে (Morpho-phonemic Domain) পাণিনি প্রবর্তিত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসৃত গুণ ও বৃদ্ধির নিয়ম বাংলা ব্যাকরণের শব্দগঠন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় রেখেছে। আমরা যে বাংলায় বিশেষ্য থেকে বিশেষণ নির্মাণের কৌশল প্রসঙ্গে 'ইক' প্রত্যয় যোগ করি, সেই কাজে সংস্কৃত তথা পাণিনি নির্মিত সূত্র দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

'বৌদ্ধ সংস্কৃত: ধারণার পুনর্মূল্যায়ন' প্রবন্ধটিতে লেখক 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' নামটি কে দিয়েছে, এর উৎপত্তি কোথা থেকে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন– বৌদ্ধ-সভ্যতার বিস্তার, বৌদ্ধ মতবাদের সম্প্রসারণ, হিউয়েন সাঙ এর দেখা ভারত এবং তিনি কোন ভাষায় কথা বলতেন, একেশ্বরবাদের সূচনা, সাংকার্য ও সংস্কৃতায়ন, ভাষা-পরিস্থিতি ও নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশনা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জিজ্ঞাসা, বৌদ্ধযুগের লিপিতাত্ত্বিক অবস্থা, সমকালীন পরিস্থিতির অনুরূপতা, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও এডগারটন, সংবিধিবদ্ধ ভাষার অনুকৃতি সম্পর্কে।

'সাংকর্য ও সংস্কৃতায়ণ' উপ-অধ্যায়ে লক্ষ করি গুপ্তযুগে (৩২০-৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ), পালযুগে (৭৫০-১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ) এবং সেনযুগে (১০৭০-১২৩০) এ অঞ্চলে ভাষা সাংকার্য ও ভাষা প্রমিতায়ন এই দুটি ব্যাপার ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। বঙ্গদেশের গ্রামের নামকরণে ব্যাপক সংস্কৃতায়ন প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন– শ্রীনগর, শ্রীমঙ্গল, শ্রীহট্ট, প্রাগজ্যোতিষপুর, বর্ধমান, কর্ণ-সুবর্ণ, পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, গোকর্ণ ইত্যাদি। নদীর নামকরণেও এই সংস্কৃতায়নের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন– ময়ূরাক্ষী, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, সুবর্ণরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষ। বৌদ্ধবিহারগুলিও সংস্কৃতমুখী।

'বৌদ্ধ সংস্কৃত: ধারণার পুণর্মূল্যায়ন'– প্রবন্ধটির শেষের দিকে এসে 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' এই নামটির জট আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। দেখা যায় যে, বৌদ্ধ সংস্কৃতের কোনো সমকালীন অস্তিত্ব ছিলনা। এ নামে কোনো রীতি প্রচলিত ছিল না। ধারণাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক প্রখ্যাত পণ্ডিত এডগারটনের উদ্ভাবনা। সুতরাং ঐতিহাসিক দিক থেকেই বৌদ্ধ সংস্কৃতে এই সম্প্রত্যায়ের কোনো অস্তিত্ব নেই।

সুতরাং, এডগারটন যে Buddhist Hybrid Sanskrit রীতির কথা বলেছেন, সেই রীতি ওই যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। তিনি সংকর কথাটি বলেছেন। এই কথাটিও সামাজিক উপভাষা কথাটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, ভাষা যখন কোনো নতুন পেশায় বা নতুন কাজে বা নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু শব্দ মূল রীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে সম্ভবত তা-ই হয়েছিল। অর্থাৎ 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' কোনো নতুন ভাষা নয়; পাণিনি নির্ধারিত সূত্রাবলির বিলোপ, সম্প্রসারণ ও সংযোজনের ফলেই এই রীতি গড়ে উঠেছে। এটি একটি উপভাষা।

'ভাষাবৃত্তি'-তে আমরা দেখি লেখক ভাষাবৃত্তি সম্পর্কিত অনেক আলোচনা করেছেন এবং এ কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পণ্ডিতগণের কাজ উল্লেখ করেছেন। 'ভাষাবৃত্তি' বলতে আমরা সাধারণ অর্থে বুঝে থাকি– ভাষার যা উদ্দেশ্য তাই ভাষাবৃত্তি। অর্থাৎ এটি কোনো মৌলিক ব্যাকরণ নয়। এটি পাণিনির 'অষ্ট্যাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণের টীকাভাষ্য।

শিক্ষার সাথে ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর ভাষাচিন্তা যখন থেকে মানুষের উপলব্ধির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন থেকেই ভাষার প্রসঙ্গ আসে। আর তখনকার দিনে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা, বিশেষ করে বামন– জয়াদিত্য, জিনেন্দ্র বুদ্ধ, মৈত্রেয় রক্ষিত এবং পুরুষোত্তম দেব বৈয়াকরণ হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী কলেজের সংস্কৃতের সিনিয়র প্রফেসর শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'ভাষাবৃত্তি' নিয়ে কাজ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'কাশিকারঞ্জন বৃত্তি' সম্পাদনা করেছিলেন। এটি সম্পন্ন করার পর আমরণ অনশন শুরু করেন এবং ৭ দিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভাষা সম্পর্কে মানুষের যত আগ্রহ তৈরি হতে লাগলো ততই মানুষ ভাষা চর্চা শুরু করলো এবং একটি ভাষার সাথে আরেক ভাষার সম্পর্ক নিরূপণ করা শুরু করলো। নতুন নতুন শব্দকোষ মানুষকে ভাষার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুললো। সেটা শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিদেশীদের মাঝেও ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করলো। তেমনি নজির পাই আমরা লেখক মনসুর মুসার *পাণিনি, চমস্কি ও তারপর* বইটিতে।

'নতুন বাঙলা ব্যাকরণ: আলোচনা চক্র'-তে দেখা যায়–

একজন ভাষাবিজ্ঞানী ড. হানেরুথ ঠম্পসনের বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহকে বর্ণনা করেছেন। কীভাবে হানেরুথ ঠম্পসনের মনে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তার সুনিপুণ বর্ণনা পাওয়া

যায় এখানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটের মিলনায়তনে একটি কথাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই কথাচক্রে সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন মনসুর মুসা, সভাপতিত্বের দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ড. রফিকুল ইসলাম ও ড. মনিরুজ্জামান। এবং এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন ড. হানেরুথ ঠম্পসন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং রচনা করেন– 'Bengali : A Comprehensive Grammar'. হানেরুথ ঠম্পসন প্রথমে বাঙলা ভাষা অধ্যয়ন করেন, শব্দের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণ করেন। পরে তিনি ব্যাকরণ রচনার কাজে হাত দেন। বাঙলা ভাষার যে দুটি শব্দ তাঁকে আগ্রহী করে তুলেছিল সে-দুটি হলো– বৃহস্পতি ও প্রজাপতি।

বইটির নামকরণে আমরা ৩টি অংশ পেয়েছি। প্রথমত, পাণিনি; দ্বিতীয়ত, চমস্কি; তৃতীয়ত, তারপর।

ভাষার সামগ্রিক উদ্ভব নিয়ে পাণিনি ও কালক্রমে অনেক পণ্ডিতের মতামত ও আলোচনা সম্পর্কে আমরা পাণিনি পর্বে বিশেষভাবে অবগত হয়েছি। পরবর্তী পর্বে আলোচিত হয়েছে ভাষাতত্ত্বে চমস্কির অবদান সম্পর্কে। চমস্কির সৃষ্টিশীল ব্যাকরণতত্ত্বের কারণে ভাষার আচরণবাদী তত্ত্ব ভাষার বোধিগততত্ত্ব দ্বারা স্থানচ্যুত হয় এবং ভাষার বোধিগততত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে চমস্কির ফলেই নতুন বিজ্ঞান 'Psycholinguistics' (মনোভাষাবিজ্ঞান)-এর উদ্ভব হয়। এছাড়াও মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কি জেনারেটিভ ভাষাতত্ত্বেরও প্রবক্তা।

নোয়াম চমস্কির *সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার্স* (১৯৫৭) সালে প্রকাশিত হয়। তিনি প্রাণির যোগাযোগ সংশ্রয়ের অনির্দিষ্ট ক্ষমতার ওপর বক্তব্য রাখেন। এরপর ক্রমান্বয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ব্যাকরণে বাক্য আলোচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তবে, চমস্কির *সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার্স* পাঠ করতে হলে ভাষাতত্ত্ব, গণিত এবং যুক্তিবিদ্যার পটভূমি মনে রাখা জরুরি।

নোয়াম চমস্কির *সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার্স* আলোচনার সূচনা ঘটেছে দুটি বাক্য নিয়ে। একটির বাংলা করলে তা হবে–

১. 'রংহীন সবুজ ভাবগুলো ঘুমায় হিংস্রভাবে' (Colourless green ideas sleep furiously)
২. 'হিংস্রভাবে ঘুমায় ভাবগুলো সবুজ রংহীন'

বাক্য দুটিকে আমরা দেখি বৈয়াকরণিক দিক থেকে ঠিক আছে কিন্তু অর্থগত দিক থেকে এটি গ্রহণযোগ্যতা পায়না। তাই তাঁর মতে এটি অবৈয়াকরণিক। সুতরাং দেখা যায় যে, বাক্যের

বৈয়াকরণিকতা ও গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে একটি ব্যবধান থেকে গেছে। এ বিষয়টি পাণিনির আগে কেউ প্রয়োগ করেননি।

ভাষাপ্রবাহ ও চর্যার ভাষা : বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ। প্রাচীনকাল থেকেই চর্যার ভাষা নিয়ে বেশ কিছু মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। চর্যাপদের ভাষা নিয়ে বিতর্ক, উপলব্ধির প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি রয়েছে। তারপরও লেখক এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, চর্যার ভাষা নিয়ে কোন কোন পত্রিকা এ পর্যন্ত লেখালেখি করেছে। কিন্তু দেখা যায় পত্রিকার সম্পাদকীয় মতামতে, মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে চর্যার ভাষা সংক্রান্ত বিচার বিবেচনার অন্ত নেই। লেখক এখানে চর্যার ভাষা বিষয়টিকে উত্থাপন করেছেন। চর্যাপদের ভাষা বিষয়ে যে অস্বচ্ছতা যুগের পর যুগ ধরে আমাদের মনে রয়েই গেছে, তার পেছনে কয়েকটি কারণ লেখক দেখিয়েছেন–

১. উপলব্ধির বিতর্ক
২. ভাষাপ্রবাহ সম্পর্কে অস্বচ্ছতা
৩. ভাষিক তাৎপর্য
৪. তৎকালীন ভাষা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব

পর্যায়ক্রমে লেখক মনসুর মুসা 'ভাষাভেদ ও ভাষাবোধ', 'ভাষা-ভাবনা বিষয়ে' বিভিন্ন পণ্ডিতের অবদান উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন– গোপাল হালদার (উপভাষা-ভাবনা), সৈয়দ মুজতবা আলী (রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে), অন্নদাশঙ্কর রায় (ভাষাচিন্তা) ইত্যাদি। এরপর জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন ঢাকাই ভাষার নমুনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। গ্রীয়ারসন ঢাকাই উপভাষা নিয়ে কাজ করার পর দু'জন গবেষকের ঢাকাই উপভাষা সংক্রান্ত কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– একজন অনিমেষ কান্তি পাল, অপরজন মনিরুজ্জামান। দু'জনই ঢাকার সন্তান। ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার পরিসর ব্যাপক হতে থাকে এবং বাংলা ভাষা সাংবিধানিক মর্যাদা পায়। বাংলা ভাষা ও প্রযুক্তির বিস্তার ঘটতে থাকে এবং সেটি আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শেষের দিকে এসে আমরা বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে লেখককে বেশ উদ্বিগ্ন হতে দেখেছি। কেননা লেখকের মতে, বাংলা ভাষার চর্চা ক্রমাগতই কমে যাচ্ছে আর গুটিকতক যারা বাংলা চর্চা করার সামান্য চেষ্টা করছে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে তাদের গতিবিধিকে সমুন্নত রাখতে পারছে না।

এই গ্রন্থের শেষে লেখক ভাষার বহিঃগঠন, অর্ন্তগঠন এবং বৈয়াকরণিক ও অর্থগত দিক শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের ভিত্তিতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: তার ভাষিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য' এই অধ্যায়ে গবেষক মনসুর মুসা ঐতিহ্যবাহী সেই ভাষণে বলা প্রতিটি বাক্যের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক বাক্যগুলো গণনা করে ১০০৭টির মতো বাক্য পেয়েছেন এবং সেগুলো বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য নম্বর দিয়েছেন। এবং দেখিয়েছেন কোন বাক্য কোন আওয়াজে, কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন বাক্য

কতবার উচ্চারিত হয়েছে এবং কতটি খণ্ডাংশে গঠিত হয়েছে সেটারও বিস্তারিত আলোচনা আমরা এখানে দেখতে পাই।

আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটির বাক্যগুলোর মোট ৭৫টি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করি। এখানে ৬৫ প্রকারের বাক্য ১টি করে আছে। ১০টি বাক্যের প্রকারভেদে একাধিক বাক্য এসেছে। যেমন : প্রত্যাশাবাক্য আছে ৩টি, সমব্যথী ও সমবেদনামূলক বাক্য আছে ৪টি, ঐতিহাসিক বঞ্চনার স্মৃতিজাগানিয়া বাক্য ২টি, প্রতিপক্ষের অন্যায়কর্ম নির্দেশ বাক্য আছে ২টি, প্রতিপক্ষের অন্যায়ের স্বরূপ উন্মোচন বাক্য ২টি, শর্তবাক্য আছে ৬টি, নির্দেশবাক্য আছে ১২টি, বিকল্প নির্দেশ বাক্য আছে ৪টি, আদেশ বাক্য আছে ২টি, সতর্কবাক্য ২টি, ঘোষণাবাক্য ও প্রতিজ্ঞামূলক বাক্য আছে ২টি করে।

সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থে ভাষাবিজ্ঞানী মনসুর মুসার ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানীদের বিষয়ে যে ধারনা ও পঠন-পাঠন তারই একটি প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি। গ্রন্থটি ভাষা বিষয়ের ওপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মোছাঃ খাদিজা খাতুন মিম*

* গবেষণা সহকারী, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার